Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501023 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

An Alternative Reading of the Mahabharata by Pratibha Basu
মহাভারতের ভিন্ন পাঠ: প্রতিভা বসুর কলমে

Dr. Rachana Roy
Associate Professor
Bengali Department, Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya
North 24 Parganas

Received on: 18th April 2026
Accepted on: 30th April 2026

Abstract:
The question of who the protagonist of the epic Mahabharata is to arise among readers. The great poet of the Mahabharata, Krishna Dwaipayana Vyasadeva, created numerous characters, each of whom is worthy of being a hero. Some learned scholars have nominated Arjuna as the hero of the Mahabharata. According to some, Krishna is the ideological controller of this epic; therefore, he is the hero. In the opinion of others, the noble Bhishma remained present from the beginning to the end of the main story, supporting the entire narrative like a backbone; hence, he is the hero of this work. Many again believe that Karna could have been the most deserving hero of this epic, but due to a lack of the great poet's grace, he was deprived of the honor of being the protagonist. The great poet Vyasadeva made the first Pandava, Yudhishthira, the hero of his poem. There is abundant evidence of this within the text. Many modern learned scholars have accepted Yudhishthira's heroism. However, many refuse to accept Yudhishthira as the hero, among whom the litterateur Pratiba Basu is prominent. She expressed her lifelong realization of reading the Mahabharata in the book titled 'Mahabharater Maharanne'. While the common people of India, like the poet Vyasadeva, have accepted Yudhishthira as 'Dharmaraj' and recognized him as the hero of this great text, Pratiba Basu has placed Yudhishthira in the seat of a villain and made Duryodhana a partner in heroism. Although such a claim may spark initial surprise in the reader, the reader will soon be able to perceive why Pratiba Devi holds such a view. In 'Mahabharater Maharanne', Pratibha Basu has recorded several of her own ideologies. As a reader, she has every right to express her own opinion. We will examine how logical and acceptable her.

Key Words:
Mahabharat, Mahakabbo, Yudhishthir, Bidur, Durjodhan, Krishna, Mahagrantho, Dharma, Nayak

মূল প্রবন্ধ

মহাভারত নামক মহাকাব্যের মহানায়ক কে — এই প্রশ্ন পাঠক মহলে উঁকি দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। মহাভারতের মহাকবি, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এমন অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা প্রত্যেকেই নায়ক হবার যোগ্য। কোনো কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাভারতের নায়ক হিসেবে অর্জুনকে মনোনীত করেছেন। কারো মতে কৃষ্ণ এই মহাকাব্যের চালক। অতএব তিনিই নায়ক। কারো মতে মহামতি ভীষ্ম মূল কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান থেকে মেরুদণ্ডের মতো সমগ্র কাহিনিকে ধারণ করেছেন। অতএব তিনি এই কাব্যের

© Santiniketan Sahityapath

নায়ক। অনেকের আবার বিশ্বাস কর্ণ এ মহাকাব্যের যোগ্যতম নায়ক হতে পারতেন। কিন্তু মহাকবির কৃপা দৃষ্টির অভাবে তিনি নায়কের সম্মান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মহাকবি ব্যাসদেব তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে। কাব্যমধ্যে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। একালের বিদগ্ধ পণ্ডিত (যেমন সুকুমারী ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, রাজশেখর বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি) যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব স্বীকার করেছেন। অবশ্য অনেকেই যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃত। তাদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধদেব বসুর জায়া প্রতিভা বসু। বিরাশি বছর বয়সে তিনি সারা জীবনের মহাভারত পাঠের উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'মহাভারতের মহারণ্যে' নামক গ্রন্থে। দময়ন্তী বসু সিংহের প্রকাশনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল বিকল্প প্রকাশনী থেকে — ১৯৯৭ সালের নববর্ষের দিন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং নামাঙ্কন করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং গ্রন্থটির প্রচ্ছদে যে ছবি অঙ্কিত তা নন্দলাল বসু কৃত স্কেচ 'দুর্যোধন'। নামকরণ নয় বরং গ্রন্থটির প্রচ্ছদ দেখেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আপামর ভারতবাসী যেখানে কবি ব্যাসদেবের মতো যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মরাজ' মেনে তাকেই এই মহাগ্রন্থের নায়কের মান্যতা দিতে পছন্দ করে, সেখানে প্রতিভা বসু যুধিষ্ঠিরকে খলনায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দুর্যোধনকে নায়কের অংশীদার করেছেন। এমন দাবিতে পাঠকের প্রাথমিক বিস্ময় জাগ্রত হলেও সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ শেষে পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন কেন প্রতিভা দেবী এরকম ধারণা পোষণ করেছেন। প্রায় সমগ্র মহাভারত আলোচনা করে প্রাবন্ধিক তাঁর নিজস্ব যুক্তিজালে প্রমাণ করেছেন মহাভারত আসলে 'শুদ্ধ শোণিতের চূড়ান্ত পতন ও বিলুপ্তি'র কাহিনি।

প্রতিভা বসু বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে মহাভারত পাঠের অভিঘাতে মহাভারত সম্পর্কে দু'চার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন 'মহাভারতের মহারণ্যে' নামক গ্রন্থে। তাঁর নিজের কথায় —

"পাঠকের সেই একান্ত নিজস্ব অধিকারেই মহাভারত পাঠান্তে আমি অনেক ভেবেছি, বিভ্রান্ত বোধ করেছি, ফিরে পড়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে অস্বীকার করার উপায় দেখিনি। সে কারণেই জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে আমার মতামত, তা নিতান্ত অপ্রচলিত জেনেও, প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করলাম।"[১]

গ্রন্থটি আদ্যপান্ত গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যাবে, মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণকালে লেখিকা একেবারেই মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। প্রচলিত পাঠকে ভেঙে ভেঙে নতুন পাঠ রচনা করেছেন। কখনো কখনো সেই বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মনে গেঁথে থাকা সাধারণ ধারণার বহির্ভূত। বিশেষত মহাভারতের দুই মহান চরিত্র, যুধিষ্ঠির ও বিদুরকে লেখিকা সুনজরে দেখেন নি। এমনকি মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও লেখিকার কাছে 'অতীব পক্ষপাতদুষ্ট'। তাঁর মতে এই কাহিনি মহান আর্য বংশ বা ভরতবংশের কাহিনি নয়; 'প্রকৃতপক্ষে সত্যবতী-দ্বৈপায়নের বংশের ইতিহাস', যেখানে আর্য রক্ত নেই, কেবলই অনার্য বংশের ইতিকথা।

প্রতিভা দেবী মহাভারতের সর্বজন স্বীকৃত কাহিনি অবলম্বন করে আলোচনা করলেও চরিত্রগুলিকে অনেকাংশই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ যেন প্রচলিত পাঠের সমান্তরাল আর এক নতুন পাঠের ভাষ্য। তাঁর গ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভাজিত। প্রথম পর্বে রয়েছে নটি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে এগারোটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে পরপর বেশ কয়েকটি পরিচ্ছদ জুড়ে ভরত বংশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আলোচনার শুরুতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন শকুন্তলা-দুষ্মন্তের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পুত্র ভরতের নাম অনুসারে এই বংশের নাম হয় ভরতবংশ। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয়, প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাবর্তন লেখিকা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে শকুন্তলা ভরত বংশের 'স্থাপয়িত্রী'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখিকা শকুন্তলার কয়েক প্রজন্ম পর শান্তনু-সত্যবতীর প্রণয় কাহিনি ব্যাখ্যা করে কুরু বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে লেখিকার মতে এটি ভরত বংশের কাহিনি হলেও আসল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সত্যবতী ও দ্বৈপায়ন। মহাভারত কেন্দ্রিক এই সমালোচনা গ্রন্থে লেখিকা নারীবাদী দৃষ্টিতে মহাভারতকে বিচার করেছেন। ফলত শকুন্তলা সত্যবতী কৃষ্ণা প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিভা দেবী জানেন 'মহাভারত এক সহস্রকোণ বৈদুর্যমণি। তার বিচ্ছুরণ নানা দিকে প্রতিভাত'। তিনি যে-কোনো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মহাভারতীয় উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতো মহাভারতের আলোচনা কালে তিনি একাধিক পুরাণ, সংস্কৃত গ্রন্থ বা অন্যান্য মহাকাব্য পাঠ

করেন নি, যেমন করেছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য, বুধদেব বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। বাংলা ভাষায় অনূদিত কালী সিংহের মহাভারতকেই তিনি আকরগ্রন্থ হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাজশেখর বসু রচিত 'মহাভারতের সারানুবাদ' গ্রন্থটিরও সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থে গ্রথিত সমস্ত বক্তব্য লেখিকার একান্তই নিজস্ব। তা সে যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন!

'বিতর্কমূলক' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ, লেখিকার বক্তব্য কখনো কখনো চিরায়ত মহাভারত চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাভারতের সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে কিছুটা ভিন্নপথে তিনি মহাভারতের মহারণ্যে প্রবেশ করেছেন। মহাভারতীয় চরিত্রের নতুনতর ব্যাখ্যায় এবং বহু ঘটনার তিনি পুনর্নির্মাণ করেছেন। ব্যাসদেব কথিত ঘটনাধারাকে কোথাও কোথাও প্রাবন্ধিক অস্বীকার করে নিজস্ব ধারণা প্রসূত ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে এ গ্রন্থ পাঠককে নতুনভাবে মহাভারত সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে। প্রাবন্ধিকের চমকপ্রদ বর্ণনা পাঠকের প্রচলিত চিন্তাধারায় আঘাত করে পাঠকের মনে নতুন ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটায়। পাঠককে নানা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য ভাবনায় আলোড়িত করে, বিচলিত করে, বিভ্রান্ত করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'মহাভারতের মহারণ্যে' মহাভারত নামক মহাগ্রন্থকে প্রতিভা দেবী একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' কাশীদাসী মহাভারতের এই সুপ্রচলিত বাণীকে উপেক্ষা করে, শাঁওলী মিত্র কথিত "মহাভারতের কথা অমৃত সমান / যুগে যুগে হয় তার নতুন ব্যাখ্যান"[২] — এই ভাবনাকে লেখিকা মান্যতা দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে এই কাব্য কখনোই 'ধর্মগ্রন্থের' সম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সমগ্র মহাভারত পাঠ করে লেখিকার মনে হয়েছে —

"এই গ্রন্থ যেন আমাকে এই শিক্ষাই দিলো যে যেমন ভালো বলে কিছু নেই, তেমনই মন্দ বলেও কিছু নেই। সত্য বলেও কিছু নেই, মিথ্যে বলেও কিছু নেই। ধর্ম বলেও কিছু নেই, অধর্ম বলেও কিছু নেই। যা আছে তা কেবল সুবিধাবাদীর সুবিধাভোগ। এবং ন্যায়-অন্যায় বলে যা কিছু আমরা শিখেছিলাম, মহাভারতের মহারণ্যে সে দুটি ধারণার জন্মই হয়নি।"[৩]

এরপর প্রথম পর্বে পর পর যত অনুচ্ছেদ আমরা অতিক্রম করব ততই দেখব প্রাবন্ধিকের মৌলিক ভাবনায় মহাভারতের চিরায়ত কাহিনি ও চরিত্রগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন এখানে ক্ষত্রিয় শোণিতের কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রতিভা দেবী বিশ্বাস করেন এই মহাকাব্য কোনো আর্য সংস্কৃতির বীরত্বের মহান কাহিনি নয়, পক্ষান্তরে তা অনার্য ধীবর সত্যবতী ও তাঁর অনার্য অবৈধ পুত্র দ্বৈপায়নের বংশের ইতিহাস। মহান ভরত বংশের এখানে কোনো গুরুত্ব নেই। মহাভারত যে একখানি মহৎ গ্রন্থ, একথাও প্রতিভা দেবী মানতে নারাজ। মহাভারতে তিনি কোন 'মরাল' খুঁজে পাননি যদিও একথা সর্বজন মান্য যে 'ধর্ম' মহাভারতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু লেখিকা তা মানেন না। মহাভারতে যে দুজন মানুষকে ধর্মের পরাকাষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে প্রতিভা দেবী বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিদুর সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের ধারণা যথেষ্ট তিক্ত। বিদুর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য —

"আমরা জানলাম তিনি নাকি সাক্ষাৎ ধর্ম; কিন্তু দেখলাম, কার্যক্ষেত্রে তিনি অতি প্রকটভাবে, এবং অলৌকিকভাবে, কৌরবপক্ষ বিরোধী (বিশেষত দুর্যোধনের), এবং ততোধিক অযৌক্তিক ও নির্লজ্জভাবে, আপাতত অচেনা, অকস্মাৎ আবির্ভূত, পাঁচমেশালী পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার (বিশেষত যুধিষ্ঠিরের) পক্ষপাতী।"[৪]

প্রথম পর্বের নটি পরিচ্ছেদ জুড়ে লেখিকা বারংবার প্রমাণ করেছেন কীভাবে দ্বৈপায়ন, বিদুর ও কুন্তীর চক্রান্তে যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে সিংহাসন লাভের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে দুর্যোধনের তুলনায় পিতৃপরিচয়হীন পাঁচ জন যুবক তীব্র লোভে কুরু সিংহাসন লাভের জন্য লালায়িত। আর তাঁদের সাহায্য করেছেন যুধিষ্ঠিরের পিতা বিদুর এবং বিদুরের পিতা দ্বৈপায়ন। ভীমকে বিষপান বা বারণাবতে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত কখনোই দুর্যোধনের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না। যদি থাকে তবে দুর্যোধনকে সর্বসমক্ষে 'পাপিষ্ঠ' প্রমাণ করতে বিদুরের অপপ্রচার। দুর্যোধন কেবলমাত্র বিদুরের প্রচারেই 'দুরাত্মা' বলে প্রচারিত হয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক যে কথাটি বারংবার জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, তা হলো যুধিষ্ঠিরের পিতা কোনো দেবতা নয় বরং বিদুর। এর পূর্বে 'যুগান্ত' গ্রন্থে মহারাষ্ট্রীয় প্রাবন্ধিক ইরাবতী কার্বের মহাভারতীয় আলোচনায় উক্ত মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিক বুধদেব বসু ইরাবতী কার্বের যুক্তিগুলিকে আপন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে খণ্ডন করলেও প্রতিভা বসু ইরাবতী দেবীর বক্তব্যের সমর্থক — "আমি ইরাবতীর যুক্তিগুলির মধ্যে আমার নিজস্ব চিন্তার সমর্থন পাই"।[৫]

© Santiniketan Sahityapath

ইরাবতী কার্বের মতো প্রতিভা বসুও বিশ্বাস করেন যুধিষ্ঠির মানবপুত্র এবং তিনি বিদুরের ঔরসে কুন্তী গর্ভজাত। লেখিকার বলিষ্ঠ উচ্চারণ — "বাস্তববাদী মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানবীয় ব্যবহারের কার্যকারণ খুঁজলে, বিদুর-যুধিষ্ঠিরের রহস্যাবৃত সম্পর্ক পিতাপুত্র ব্যতীত অন্য কিছু মনে হয় না। সত্যি বলতে, বিদুরের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদুরের একচক্ষু ব্যবহার সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র মেনে না নিলে মহাভারতের মূল ঘটনাসমূহের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া অসম্ভব।"[৬]

প্রতিভা দেবী বিদুর সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেছেন আপন পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসন আরূঢ় করতে মহাভারতীয় যাবতীয় ঘটনাবলি বিদুরের কূটকৌশলে সংঘটিত হয়েছে। বারণাবতে জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাও নিছক বিদুরের মস্তিষ্কপ্রসূত। শুধু তাই নয় পাণ্ডবদের মহান, ধর্মাচারী, সত্যবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদুর চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-সহ দুর্যোধন ও তাঁর ভাইদের নিন্দায় সর্বদাই মুখর থাকতেন। রাজমন্ত্রী হয়েও রাজ্যের প্রতি তিনি কোনো কর্তব্য না করে কেবলই ধৃতরাষ্ট্রকে কুমন্ত্রণা প্রদান করেছেন। তুলনায় কণিক নামক মন্ত্রীটি ধৃতরাষ্ট্রকে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ মহাভারত পাঠক মাত্রই এর বিপরীত সত্য জানেন। অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি প্রতিভা দেবীর এই আলোচনার তীব্র সমালোচনা করেছেন —

"কতগুলি প্রলাপজ্ঞ পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের অবৈধ সন্তানরূপে চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য — এঁরা অবৈধতার মধ্যেই একমাত্র রস খুঁজে পান। অতএব কোনও মহাভারতীয় প্রমাণ ছাড়াই এঁরা নাটক লিখতে ভালবাসেন। এঁদের খেয়াল থাকে না — অবৈধতার কোনও বিষয় মহাভারতের কবি লুকোন নি। অতএব যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে নতুন কোনও অবৈধতার আবিষ্কার করতে গেলে রস জারিয়ে ওঠে এবং তাতে সমানধর্মা সহৃদয়ের রসাভাস পুষ্ট হয়। তাঁর দিক থেকে লাভ এইটুকুই।"[৭]

ব্যাসদেব কথিত মহাভারতের বনপর্বের পূর্বে দুর্যোধনের দুরাচারের প্রতিটি ঘটনাকে প্রতিভা দেবী আপন যুক্তি বলে নস্যাৎ করেছেন। প্রথমত, মহাভারত থেকে জানা যায়, বালক-কিশোর বয়সে দুর্যোধন ভীমকে বিষ মেশানো লাড্ডু খাইয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু প্রতিভা দেবী জানিয়েছেন, দুর্যোধন ও তাঁর ভাইরা ভীমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে এমন আচরণ করেছেন। খেলার ছলে ভীম তাঁদের সঙ্গে যে আচরণ করতো দুর্যোধন ও তাঁর শত ভাইদের কাছে তা উৎপীড়ন ও অত্যাচার সদৃশ্য। তাই "ভীমের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুর্যোধন শেষে এই প্রাত্যহিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ভীমের মিষ্টান্নে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে লতাপাতা দিয়ে হাত পা বেঁধে জলের ধারে ফেলে রেখে এলো। হিংসার পরিবর্তে এই তাদের প্রথম প্রতিহিংসা।" লক্ষণীয় প্রাবন্ধিক এখানে ভীমকেই আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং দুর্যোধনকে নিতান্তই সুবোধ বালক হিসেবে গণ্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে জতুগৃহে মাতা কুন্তী-সহ পুড়িয়ে মারার গভীর চক্রান্ত করেছিলেন। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন এটি ছিল নিছক রটনা মাত্র। বিদুর সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন দুর্যোধনের নামে দুর্নাম করার অভিপ্রায়ে। তৃতীয়ত, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হন এবং মাতুল শকুনির পরামর্শে পাশা খেলার মাধ্যমে তাঁদের সর্বস্ব হরণ করার পরিকল্পনা করেন। বর্তমান আলোচনায় প্রাবন্ধিক মনে করেছেন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ইন্দ্রপ্রস্থে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে অপদস্থ করেছিলেন। ময়দানব কর্তৃক মায়ানগরীর মায়া বুঝতে না পেরে কিছু ভুল আচরণ করলে দ্রৌপদী-সহ সকলে তাঁকে উপহাস করেন। মূলত এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই দুর্যোধন পাশা খেলার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাস কথিত মহাভারতে উক্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও কোথাও দুর্যোধনকে অসম্মান বা অপদস্ত করার ঘটনা লিপিবদ্ধ নেই। বস্তুত প্রাবন্ধিকের দৃঢ় বিশ্বাস যে দুর্যোধন একজন সৎ, প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। সমগ্র মহাভারত জুড়ে তাঁর নামে যে কলঙ্ক রচিত হয়েছে, তা কেবল বিদুর ও তাঁর পিতা দ্বৈপায়নের প্রচেষ্টায়। লেখিকার আশ্চর্য যুক্তিগুলি মহাভারতের নিবিষ্ট পাঠককে বিহ্বল ও বিচলিত করে তোলে —

"দুর্যোধনকে বিদুর অবিশ্রান্ত অবিরাম শাপশাপান্ত করছেন, প্রচার চালাতে চালাতে রাজ্যবাসীদের মনে বিষ ধরিয়ে দিচ্ছেন, যার ফলে সহস্র সহস্র বছর পেরিয়ে আজও মানুষের মন থেকে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাটিত নয়। ভাগ্যের করুণা যে কখন কার ওপর বর্ষিত হয় বোঝা দায়। কপটতার মুখোশ পরে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে সব পলিটিশিয়ানই পটু। বিদুর এক শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক, ক্ষমতালোভী চতুর মহামন্ত্রী।"[৮]

© Santiniketan Sahityapath

রটনা দিয়ে ঘটনার বিকৃতি ও পরিবর্তন করা সম্ভব। বর্তমান রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিভা বসু মনে করেন মহাভারতের বহু ঘটনার বিকৃত রটনা হয়েছিল। বিশেষত্ব কৌরব পক্ষ ও দুর্যোধনের নামে যে মিথ্যা কুকর্মের প্রচার চলেছিল, তাতে তাঁদের চরিত্রে বিনা কারণে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। অথচ বিদুর, কুন্তী, পঞ্চপাণ্ডবেরা মুখোশধারী হলেও সমগ্র মহাভারত জুড়ে তাঁদের 'ধর্মপক্ষ' বলে ঘোষিত হয়েছে। ফলত লেখিকার মনে বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে —

"কেন দুর্যোধন মন্দ, যুধিষ্ঠির ভালো বলে কথিত, কেন দ্বৈপায়ন স্বীকৃত অথচ কর্ণ প্রত্যাখ্যাত, কেন বিদুর ধর্ম, কেন কুন্তী সতী, আর কেনই বা চতুর কৃষ্ণের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হলো? সে কি কৃষ্ণ কৃষ্ণাজ্ঞা বলেই? বিদুর এবং যুধিষ্ঠির অবৈধ বলেই? কুন্তী বহুগামিনী বলেই? রটনা দিয়ে ঘটনাকে বদলানো যায় সেটা আমরা সাম্প্রতিক রাজনীতিতেও দেখতে পাই। কিন্তু মহাভারতে ধর্মের বর্ম পরিয়ে যে-ভাবে কৃষ্ণাজ্ঞা এবং অবৈধদের প্রতি প্রকট পক্ষপাত প্রদর্শন করা হচ্ছে, শুধুমাত্র অক্লান্ত রটনার সাহায্যে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা হচ্ছে, এবং দ্বৈপায়নের পক্ষপাত অনুযায়ী কিছু মানুষকে অতিমানবের চেহারা-চরিত্র দিয়ে জিতিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।"[৯]

কিন্তু লেখিকার এই সকল মন্তব্য মেনে নিতে আমাদের বেশ কিছু আপত্তি রয়েছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার মতান্তরে তিন হাজার বছরের পুরনো কাহিনিতে নিশ্চয়ই যুগের কালিমা বা পলেস্তারা পড়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনির গতিমুখ কখনোই পরিবর্তন হয়ে যায়নি। ব্যাসদেব যে কাহিনি রচনা করেছেন, তাতে সকলের চরিত্রগত ক্রিয়া-কলাপের কার্যকারণ সূত্র বোঝা যায়। লেখিকা অনেকাংশেই ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। 'মহাভারতের কথা'য় বুধদেব বসু বা পুরাণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী নানা তত্ত্বকথায় ও তথ্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে প্রতিভা দেবীর মন্তব্যের বহুলাংশে বিরোধিতা করেছেন। বিশেষত্ব যুধিষ্ঠির বা বিদুর চরিত্রে প্রতিভা দেবী যে অপব্যাখ্যা করেছেন, তাকে যুক্তির জালে খণ্ডন করেছেন প্রতিভাবান পণ্ডিতপ্রবর প্রাবন্ধিকগণ — "যাঁরা লিখবার সময় নিজেরাই বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা উপন্যাস লিখছেন না প্রবন্ধ লিখছেন, তাঁদের কথা অনালোচ্য। তবুও যে মাঝে মাঝে আলোচনায় যাচ্ছি তা শুধুই এই কারণে যে, মহাভারতের কবি যথেষ্ট করুণভাবেই তাঁর প্রিয়তম পুত্রের চরিত্র অঙ্কন করেছেন; সেই কারুণ্যের মাঝখানে যদি অনর্থক কলঙ্কলেপন করে বিদুরকে নিন্দনীয় করে তোলা হয়, তা হলে মহাভারত তথা বিদুরের জনক স্বয়ং ব্যাসের শব্দ-সরস্বতীর শুভ্র বসনখানিই মসীলিপ্ত হয়ে যাবে।"[১০]

ইতিহাস বলে, প্রাচীনকালে আর্যরা যে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন করেছিল সেখানে পেশার ভিত্তিতে সকলের বর্ণ নির্ণিত হতো। অধ্যাপক শামীম আহমেদ 'মহাভারতের ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতির' আলোচনায় তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এ বিষয়ে সহমত। কর্মের ভিত্তিতেই চতুরাশ্রম প্রথা চালিত হতো। কখনোই জন্মের ভিত্তিতে নয়। মহাভারতে আমরা আর্যদের সমাজ কাঠামোর একটি ধারণা পাই। সেখানে অনেকাংশেই কর্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ বিভাজনের পরিচয় রয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রাবন্ধিকের প্রহেলিকা-সম মন্তব্য —

"সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, মহাভারতের গল্প বহিরাগত আর্যশাসকদের বিরুদ্ধে অনার্য, কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণসংকর, জাতিবৈষম্যে বিড়ম্বিত দেশবাসীর অস্তিম প্রতিশোধ। শুদ্ধ শোণিতের গরিমালুপ্তির ইতিহাস। হিন্দুধর্মে যতই জাতবিচারের প্রচলন থাক, ভারতবর্ষের মাটি থেকে যে রক্তের শুদ্ধতা বহু যুগ পূর্বেই ধুয়ে মুছে গেছে, ভরতবংশের এই মহিমান্বিত কাহিনী তার দলিল।... বহিরাগতদের সঙ্গে আদিনিবাসীদের মিশ্রণ অতি নিবিড় এবং গভীর ছিলো বলেই পেশাভিত্তিক জাতবিচারের প্রয়োজন হয়েছিলো, শোণিতের শুদ্ধতার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। দ্বৈপায়নের গল্প তাঁর পুত্র-পৌত্রদের নিয়ে, কিন্তু অতীব পক্ষপাতদুষ্ট।"[১১]

দ্বিতীয় পর্বে অনুচ্ছেদের সংখ্যা ১১। প্রতিটি অনুচ্ছেদ জুড়ে লেখিকা মহাভারতের নব নব চমকপ্রদ ব্যাখ্যা উন্মোচন করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদ থেকেই তিনি পূর্বের ন্যায় বিদুর ও যুধিষ্টিরকে খলনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। কেবলমাত্র সভা পর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা কালে তিনি দুর্যোধন ও তাঁর বন্ধুদের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেছেন। তবে এ বিষয়েও লেখিকা নিজস্ব মতামত বেশ বিস্ময়কর, "প্রচারের সাহায্যে বিদুর তাঁকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তাতে উত্ত্যক্ত হয়ে দুর্যোধন আজ যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে মাত্রাজ্ঞান হারান, খুব কি দোষের সেটা?"[১২] বস্তুত যেটা দোষের নাকি গুণের তা বিচার করবে অনুভূতিশীল, বিবেকবান 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী' পাঠক।

© Santiniketan Sahityapath

প্রাবন্ধিক সমগ্র যুদ্ধ বর্ণনাকালে একে একে দেখিয়েছেন কীভাবে পাণ্ডবেরা ছলনার দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ, ভুরিশ্রবা, শল্য ও দুর্যোধনকে পরাজিত করে যমালয়ে পাঠিয়েছেন। ধর্মের ধ্বজাধারী কৃষ্ণ-সহ পঞ্চপাণ্ডব ১৮ দিনব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলই অধর্ম ও অন্যায়কে অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। তবে এই জয় তাঁদের পরাজয়েরই নামান্তর। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' শব্দটির প্রয়োগ মহাভারতে ও গীতায় একাধিকবার রয়েছে। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের যুদ্ধ 'ধর্মযুদ্ধ' নামেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু নানা অন্যায়, অন্যায্য ঘটনায় যুদ্ধ সম্পাদিত হয়েছিল। তাই অনেকেই একে 'ধর্মযুদ্ধ' বলতে নারাজ। লেখিকা প্রতিভা বসু বিদ্রূপ করে বলেছেন — "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ — যার নাম 'ধর্মযুদ্ধ' — তা যে কতো দূর অধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি হতে পারে, কতো মিথ্যা প্রবঞ্চনা নিষ্ঠুরতা ছলনা বর্বরতা হীনতা এবং কাপুরুষতার নিদর্শনে ভরা, তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। আর যখন দেখি প্রতিটি অধার্মিক আচরণ, অন্যায় আঘাত, মিথ্যাচার এবং শঠতা এসেছে পাণ্ডবপক্ষ থেকে, প্রধানত স্বয়ং কৃষ্ণের কপটতায় আসক্তিহেতু, তখন বোঝা যায় না কী ধর্মে আমাদের উদ্দীপ্ত করা মহাভারতের উদ্দেশ্য।"[১৩]

প্রাবন্ধিক দুর্যোধনের মতো কর্ণকেও মহান চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। বস্তুত তিনি মনে করেছেন মহাভারতের কেউ যদি পূর্ণ ক্ষত্রিয় রক্তের অধিকারী হন তবে তিনি কর্ণ। কর্ণই ছিলেন এই মহাযুদ্ধের একমাত্র মহারথী। মাতা কুন্তী তাঁকে সন্তান স্নেহ না দিলেও কর্ণ কুন্তীকে মাতৃ মর্যাদায় তাঁকে দেওয়া কথা রেখেছেন। যে মহিলাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন না তাঁর কথাও তিনি পালন করেছেন। তাই লেখিকার বক্তব্য — "সত্যি বলতে, কুন্তীর কাছে দেওয়া এই অর্থহীন প্রতিশ্রুতির কাছে কর্ণ দায়বদ্ধ না থাকলে পাণ্ডবদের পক্ষে কখনোই যুদ্ধ জয় সম্ভব হতো না। যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু অবধারিত ছিলো।"[১৪] অর্থাৎ তাহলে দ্রুত যুদ্ধ সমাপ্ত হতো। পরাজিত হতো পাণ্ডব পক্ষ। সিংহাসনে আসীন হতেন দুর্দমনীয় দুর্যোধন।

প্রাবন্ধিক বেশ কিছু অভূতপূর্ব বক্তব্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এবার সূত্রাকারে দেখা যাক 'মহাভারতের মহারণ্যে' প্রতিভা দেবী কী নতুন বক্তব্য উত্থাপন করেছেন —

- মহাভারতের মহারণ্যে ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু নেই।
- মহাভারত আসলে 'সত্যবতী দ্বৈপায়নের বংশের ইতিহাস'।
- মহাভারতের কাহিনিতে আর্য নয় বরং 'কৃষ্ণবর্ণের আধিপত্য সর্বত্র'।
- দ্বৈপায়ন তাঁর মাতা সত্যবতীর অবৈধ সন্তান ছিলেন।
- কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস অনার্য ছিলেন। কারণ তাঁর পিতা কালো, মাতা কালো। "সুতরাং এই তিনজনের একজন যে আর্য নন সে বিষয়ে কোনো তর্ক নেই।"
- গঙ্গা-শান্তনুর সাতটি পুত্র দেহগত দোষে মৃত অবস্থায় জন্মেছিল। এই কারণে গঙ্গার সন্তান বিসর্জনের গল্পটি প্রচলিত।
- দেবব্রত ভীষ্ম সত্যবতীর অঙ্গুলি হেলনে চলতেন। "সত্যবতী যদি যন্ত্রী হন, দেবব্রত তাহলে যন্ত্র।"
- ভীষ্মের সত্যবতীর প্রতি এত আনুগত্যের কারণ ছিল সত্যবতীর প্রতি তাঁর হৃদয় দৌর্বল্য।
- কুন্তী ও বিদুর শলাপরামর্শ করে পাণ্ডু ও মাদ্রীকে হত্যা করেছিলেন। "এই দুটি মৃত্যু কোন ষড়যন্ত্রের দ্বারাই সংঘটিত।"
- কুরু রাজপ্রাসাদে এসে কুন্তী এমন অভিনয় করেছিলেন, যাতে তিনি সর্বসম্মুখে নির্দোষ প্রমাণিত হন।
- দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম সন্তান। কিন্তু তাঁর মাতা গান্ধারী নয়। "শুধু এটা জানি মাতা যিনি হোক পিতা প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্র।"
- গান্ধারী যখন পেটে "টিউমার" নিয়ে দীর্ঘ দু'বছর অসুস্থ ছিলেন, সেই অবসরে ধৃতরাষ্ট্র অন্যান্য রমণী-সঙ্গে তাঁর শত পুত্রের জন্ম দেন।
- ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ দুর্যোধন সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার।
- যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের থেকে বয়সে ছোটো ছিলেন।
- দুর্যোধনের জন্মের পর নানা দুর্লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়ে বিদুর দুর্যোধনকে হত্যা করতে বলেছিলেন। এর প্রকৃত কারণ ছিল "যুধিষ্ঠিরের জন্ম তখনও হয়নি বলেই বিদুর দুর্যোধনের হত্যা করার জন্য এত অস্থির ছিলেন।"
- দুর্যোধন ও দুঃশাসনের নাম প্রকৃত অর্থে ছিল সুযোধন ও সুশাসন। " 'সু টা'কে 'দু' বলে প্রচার বিদুরের দ্বারাই সাধিত হয়েছে।"

- পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর কুলপ্রথা অনুযায়ী বিবাহ হয়নি।
- কুমারীকাল থেকে কুন্তীর চরিত্র খুব শুদ্ধ ছিল না। কুমারীকালে সূর্য-সম এক ব্যক্তির দ্বারা তিনি মাতৃত্ব লাভ করেন। সেই পুত্রই কর্ণ।
- কেবল যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নয়, মাদ্রী পুত্র নামে পরিচিত নকুল, সহদেবও কুন্তীর পুত্র। সেক্ষেত্রে কুন্তীকে "স্বৈরিণী" বলা চলে অনায়াসে।
- 'যুধিষ্ঠির যে বিদুরের পুত্র' তা মাতা সত্যবতী জানতেন।
- দুর্যোধন ছিলেন স্বভাবত সংযত ও সহিষ্ণু প্রকৃতির।
- দুর্যোধন বিদুরের কাছে দুরাত্মা হলেও দুর্যোধন এমন কোনো কাজ করেন নি, যাতে তাঁকে ওই আখ্যা দেওয়া যায়।
- এই মহাগ্রন্থে দুর্যোধনকে কোথাও পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে দেখা যায়নি। কেবল বিদুরের রটনাতে তার প্রকাশ রয়েছে।
- ভীমের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ভীমকে ঘুমের ওষুধ মেশানো মিষ্টান্ন খাইয়েছিলেন দুর্যোধন। তাঁকে হত্যার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না।
- কুন্তী ও পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র কোনো অবহেলা করেন নি।
- জতুগৃহের পরিকল্পনা একান্তই বিদুরের। বিদুরের রটনা ছিল যে দুর্যোধন শকুনি কর্ণ মিলে পাণ্ডবদের অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার পরিকল্পনা করেছে।
- বিদুর ছিলেন কুটিল ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁর কুমন্ত্রণায় কুরু বংশ ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেছে।
- ধৃতরাষ্ট্র নির্বোধের মতো বিদুরের পরামর্শে সর্বদা চালিত হতেন।
- যুধিষ্ঠির কামে লোভে ক্ষমতায় অনৃতভাষণে দুষ্ট হয়েও "মহাত্মা" নামে সম্মানিত।
- "পিতামহ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রচনার চাতুর্য, পিতা বিদুরের কাপট্য আর মাতা কুন্তীর হৃদয়হীনতা এই তিন পাথেয় নিয়েই যুধিষ্ঠির চালিত হয়েছেন কুরু রাজ্য দখলের জন্য। আর এঁদের সকলের দুষ্কর্মের বোঝা বহন করেছিলেন হতভাগ্য দুর্যোধন।"
- মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম ও কর্ণই একমাত্র শুদ্ধ আর্য। এ কারণে "দ্বৈপায়ন দ্বারা উপেক্ষিত" ও বর্জিত।
- রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।
- শিশুপাল হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অনবধান অবস্থায় "একটু উঁচু থেকে নিজেকে আড়াল করে" কেউ একজন শিশুপালের মস্তকে আঘাত করে তাকে হত্যা করেছিল। কৃষ্ণ তাকে হত্যা করেন নি।
- রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাণ্ডবরা সকলে মিলে দুর্যোধনকে অপদস্ত করেছিলেন।
- দুর্যোধন ছিলেন "দেশবরেণ্য" রাজা।
- যুধিষ্ঠির ছিলেন প্রকৃত জুয়াড়ি। তিনি নিজেই শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় অভিলাষী ছিলেন।
- যুধিষ্ঠির নিজের অযোগ্যতায় পাশা খেলায় পরাজিত হয়েছিলেন, মাতুল শকুনির কাপট্যে নয়।
- পাণ্ডবেরা নিজেদের কুরুকুলের সন্তান ভাবতেন না।
- পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে কুরুকুলোচিত কোনো সংস্কৃতি বর্তমান ছিল না।
- কৌরবরা কোনো দস্যুবৃত্তি করে নি। যা করেছে তা পাণ্ডবেরাই। "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত দুর্ব্যবহার করাটাই ছিল দুর্যোধনের সঙ্গে তাদের একমাত্র সম্পর্ক।"
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কখনই ধর্মযুদ্ধ ছিল না। তা ছিল অধর্মের নামান্তর।
- যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মস্তক ছিন্ন করেন।
- মহাভারতের প্রকৃত বীর ছিলেন অর্জুন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠের আদেশে ও কৃষ্ণের নীতিহীনতার কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আত্মসমর্পণ করেছিলেন।
- কৃষ্ণ ছিলেন "ঈশ্বরের প্রতিভূ ভেল্কি দক্ষ।"

© Santiniketan Sahityapath

- অর্জুনের থেকে বড়ো যোদ্ধা ছিলেন কর্ণ।
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন। এতদিন পর তাঁর পিতা ও পিতামহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।
- শান্তনুর রাজপ্রাসাদে কোনো আর্য রক্তই আর রইল না। সত্যবতীর অনার্য রক্তই প্রবাহিত। "এই প্রাসাদের পুত্র পৌত্র সবই এখন তৈরি হয়েছে তার অবৈধ পুত্রের দ্বারা।"

মহাভারতে 'পাপাত্মা' ও 'পুণ্যাত্মা' র যে বিভাজন রয়েছে, প্রতিভাদেবী তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'মহাভারতের মহারণ্যে' প্রতিভা বসু বেশ কিছু স্বকীয় প্রতিভাষিক সত্য লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠক হিসেবে আপন মত ব্যক্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে। প্রতিভাদেবীর এই গ্রন্থখানি নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা পূর্বে হয়েছে। সমালোচক শিবনারায়ণ রায়, প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে প্রতিভা দেবীর বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত 'বৈপ্লবিক'। সমালোচক কেতকী কুশারী ডাইসন, বহু জায়গায় বিশেষত দূর্যোধন চরিত্রের পুনর্নির্মাণে প্রতিভা দেবীকে সমর্থন করেছেন। তবে আমাদের মনে হয় প্রতিভা দেবীর বক্তব্যের সত্যতার ভিত্তি যৎসামান্য। তাঁর এই দুঃসাহসী ভাষ্য কতটা গ্রহণযোগ্য এবং কতজন তাঁর এই মতের সমর্থক সেটাই বড়ো প্রশ্ন !!

বুদ্ধদেব বসু 'মহাভারতের কথা' প্রবন্ধে অতি যত্নে যুক্তির পর যুক্তিজাল বিস্তার করে যুধিষ্ঠিরের আন্তর প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ করেছেন যে মহাভারতের মধ্যে রয়েছে 'মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা' এবং তা নিয়েই এর কাহিনি সমাপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। তাঁর মতে এই বৃহৎ আকার গ্রন্থের মূল ভরকেন্দ্রে রয়েছে একটি মাত্র চরিত্র, যাকে অবলম্বন করে এই মহাকাব্যের আবর্তন এবং তিনি যুধিষ্ঠির। তিনিই এই মহাকাব্যের মহানায়ক, "একটি চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে অন্য সব বিষয় দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ হ'তে পারে — অর্থাৎ মহাভারতে আমি একজন নায়কের উপস্থিতি অনুভব করি। এবং সেই নায়ক বা কেন্দ্রিক চরিত্রটি — বহুযুদ্ধজয়ী বহুনারীসেবিত শ্রুতকীর্তি অর্জুন নন, সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তর বাসুদেবও নন — তিনি এক ধীর মৃদু লজ্জাশীল অস্থিরমতি মানুষ: তিনি যুধিষ্ঠির।"[১৫]

অথচ প্রতিভা দেবীর দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির একজন রাজ্য লোভী, অবিবেচক ও অকর্মণ্য ব্যক্তি। রাজা হবার তাঁর বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নেই। কেবল ভাইদের সাহায্যেই তাঁর সমস্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তা সে রাজসূয় যজ্ঞই হোক, পরমা সুন্দরী পত্নী হোক অথবা যুদ্ধ। চার ভাইয়ের স্কন্ধে ভর করে তার জীবনভর পথ চলা। এমন একজন অপদার্থ ব্যাক্তি কখনোই একটি মহাকাব্যের নায়ক হতে পারেন না। সমগ্র জীবন ধরে যুধিষ্ঠির কেবল রাজত্ব লাভে সচেষ্ট থেকেছেন। ভাগ্য তাঁকে সাহায্য করেছে আর সাহায্য করেছে তাঁর ভ্রাতৃগণ ও পূর্বসূরীরা। প্রাবন্ধিকের মন্তব্য —

"দুর্যোধনের মৃত্যুতে নায়িকা সত্যবতীর সমস্ত সংকল্প পূর্ণ হলো। আর এক ফোঁটা রক্তও রইলো না যা তাঁর নিজের রক্ত নয়। যাঁরা রইলেন তাঁদের একজন সত্যবতীর অবৈধ পুত্র অনার্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অবৈধ পুত্র বিদুর, আর বিদুরের অবৈধ পুত্র যুধিষ্ঠির। যে যুধিষ্ঠিরকে শান্তনুর সিংহাসন অধিকার করাবার বাসনায় তাঁর পিতা বিদুর এবং পিতামহ দ্বৈপায়নের এতো কাণ্ড, সেই যুধিষ্ঠির ঠিকই সেখানে অধিরূঢ় হলেন।"[১৬]

সামগ্রিকভাবে 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থটি পাঠ করলে কখনো কখনো মনে হয় গ্রন্থখানি মহারণ্যই বটে! এটি এমন এক অরণ্য যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না, সমগ্র বনময় স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার বিরাজমান। গ্রন্থখানি পাঠককে এমন সব ভাবনার উদ্বুদ্ধ করে যা পাঠক আগে কখনো কল্পনা করতে পারে নি। সমগ্র গ্রন্থে যেভাবে বিদুর ও যুধিষ্ঠিরকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে তাতে মহাভারতের কবি ও কাব্যের গরিমা কিঞ্চিৎ হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমন কি মহাভারতের কবি ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রও মসীমালিপ্ত। কেবল উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্র। প্রথমদিকে পিতামহ ভীষ্ম চরিত্রকে কিছুটা কলঙ্কিত করার চেষ্টা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর এমন কোনো দোষের সন্ধান লেখিকা পাননি যা ভীষ্ম চরিত্রের স্খলন দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাই লেখিকার সিদ্ধান্ত — "মহাভারতের তিনটি সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষ ভীষ্ম কর্ণ অর্জুন।"[১৭]

© Santiniketan Sahityapath

যাই হোক প্রাবন্ধিকের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আমাদের মনে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। গ্রন্থের বক্তব্য একান্তই তাঁর নিজস্ব। তবে মহাভারতে যদি সত্যিই শিক্ষণীয় কিছু না থাকতো বা ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে সম্যক ধারণা না দিত, যুগ থেকে যুগান্তরে এর কাহিনি অগ্রসর হতে পারত না। ভারতভূমি ছাড়িয়ে বিশ্ব সাহিত্যেও এই মহাগ্রন্থের আবেদন আজও অমলিন। আজও ধর্মের বিচারে বা ভারতীয় দর্শনের খোঁজে পণ্ডিতেরা মহাভারতের অনেক অংশেরই (বিশেষত ভীষ্ম পর্ব ও শান্তি পর্ব) আশ্রয় নেন। মহাভারতে একাধিক কাহিনির স্তর পরম্পরা থাকলেও কৌরব পাণ্ডবদের কাহিনি যুগ যুগ ধরে আপামর ভারতবাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের মত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য — "মহাভারতে যে-একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতের কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।"[১৮]

বস্তুত মহাভারতে যে 'বৈরাগ্য' স্থান পেয়েছে তা যুধিষ্ঠিরের হাত ধরেই। এই কারণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে 'ধর্মময় এক মহাবৃক্ষ' হিসেবে সম্মান জানিয়েছেন এবং 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ প্রজ্ঞায়' যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তার নায়ক নির্বাচন করেছেন যুধিষ্ঠিরকে। পরবর্তী কালের বহু পণ্ডিতেরাও এই মত নতমস্তকে স্বীকার করেছেন। এই মহাগ্রন্থের মহানায়ক নিঃসন্দেহে যুধিষ্ঠিরই। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

১. 'মহাভারতের মহারণ্যে', প্রতিভা বসু, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪০৪, দশম সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ১১
২. 'নাথবতী অনাথবৎ', শাঁওলী মিত্র
৩. 'মহাভারতের মহারণ্যে', প্রতিভা বসু, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪০৪, দশম সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ১৩
৪. ওই, পৃ. ১৫
৫. ওই, পৃ. ১৪
৬. ওই, পৃ. ১৪
৭. 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, আনন্দ কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২৪, পৃ. ৯১
৮. ওই, পৃ. ৫৮
৯. ওই, পৃ. ১৬
১০. 'মহাভারতের ছয় প্রবীন', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, আনন্দ, কলকাতা, মে, ২০২৪, পৃ. ৩৩৮
১১. 'মহাভারতের মহারণ্যে', প্রতিভা বসু, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ, ১৪০৪, দশম সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ১৬
১২. ওই, পৃ. ১৪৩
১৩. ওই, পৃ. ১৫-১৬
১৪. ওই, পৃ. ১৮১
১৫. 'মহাভারতের কথা', বুদ্ধদেব বসু, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, জানুআরি, ২০১৯, পৃ. ২২
১৬. 'মহাভারতের মহারণ্যে', প্রতিভা বসু, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ, ১৪০৪, দশম সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ২১১
১৭. ওই, পৃ. ১৮৮
১৮. 'প্রাচীন সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ৭১৭

—

© Santiniketan Sahityapath